সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

মো. খালিদ হাসান

বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলির মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় তের লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান, ত্রিশ লক্ষ মানুষ চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেন অন্যদিকে প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ে আহত হয়। যদি সারা বিশ্বে দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে তবে ২০৩০ সালের মধ্যে এটি হবে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে বিশ্বের মোট যানবাহনের অর্ধেকেরও কম যানবাহন থাকলেও সড়ক দুর্ঘটনাজনিত আহত ও প্রাণহানির ঘটনার ৯০ শতাংশ এসব দেশেই ঘটে থাকে।

মাধ্যমের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রধানত স্থল, নৌ ও আকাশ পরিবহণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। স্থল পরিবহণ আবার রেলপথ ও সড়কপথে বিভক্ত। সড়ক মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা অনুয়ায়ী দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ পণ্য ও ৭৩ ভাগ যাত্রী সড়ক পথে পরিবহণ হয়ে থাকে। জনসংখ্যার হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ হলেও আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে পঁচানব্বইতম দেশ। আয়তন ও জনসংখ্যার এই অসামঞ্জস্যতা ফলে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা এখন একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালকের অদক্ষতা, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ওজন, গতিসীমা না মানাসহ ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচলে ঘটে এসব দুর্ঘটনা।

বলা হয়ে থাকে কোন রাষ্টের উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকেই সে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিগত কয়েক দশক জুড়ে দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক মনোযোগের দাবীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সারা দেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়ক ও জাতীয় মহাসড়ক এবং ২ লাখ ১৭ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। এসব সড়কে চলাচল করে ৫৬ লাখ নিবন্ধিত মোটরযান । এর বাইরে লাখ লাখ অটোরিকশা-অটোভ্যান, নছিমন-করিমন-ভটভটিসহ নানা রকমের অনিরাপদ যানবাহন ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচল করে এই সড়ক-মহাসড়কে ।

সড়ক পরিবহন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর প্রতিদিন সড়কে প্রায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে । বিআরটিএর তথ্য বলছে, গত বছর দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৫ হাজার ৪৯৫টি। এসব দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৫ হাজার ২৪ জন। আহত হয়েছেন ৭ হাজার ৪৯৫ জন ।

বিআরটিএর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ৭ হাজার ৮৩৭টি যানবাহন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে মোটরসাইকেলে, যা মোট দুর্ঘটনার ২২ দশমিক ২৯ শতাংশ। দেশের মোটরসাইকেল চালকদের একটি বড় অংশ কিশোর ও যুবক। যারা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছেন এবং অন্যদের আক্রান্ত করছেন। তারপর রয়েছে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান ১৭ দশমিক ৭২ শতাংশ, বাস/মিনিবাস ১৩ দশমিক ৮২ শতাংশ, অটোরিকশা ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ব্যাটারিচালিত রিকশা ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। অন্যান্য যানবাহন বাকি দুর্ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার কর্তৃক প্রাকশিত গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অন রোড সেফটি অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনা প্রতি বছর বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ১.৩ শতাংশ ক্ষতিসাধন করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মানুষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পথচারী এবং প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার আনুমানিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ১৩.৬ জন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে ১১ শতাংশেরও কম গুরুতর আহত রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ।

সড়ক দুর্ঘটনার পেছনে বহু কারণ দায়ী এবং এই কারণগুলো একটির সঙ্গে অপরটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ বহু কারণের সমষ্টিগত ফলাফল সড়ক দুর্ঘটনা। যেমন সড়কের ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও আবহাওয়াগত সমস্যা, চালকের অদক্ষতা, বেপরোয়া আচরণ, ক্লান্তিজনিত ঘুম, পথচারীর অসচেতনতা নানাবিধ কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

আমাদের জাতীয় জীবনে সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব বহুমাত্রিক। সড়ক দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে জীবন ও সম্পদের উপর হুমকী তৈরি করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিসাধন করে থাকে। সড়ক দুর্ঘটনায় অনেকেই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে, কেউবা পঙ্গুত্ব বরণ করে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হন।

গত দশকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ জনমিতির লভ্যংশ যুগে পা দিয়েছে যার ফলে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশই তরুণ ও যুবক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই হলো এই শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী। ফলে এধরনের দুর্ঘটনার শিকার পরিবারের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ট্রমা থেকে বেড়িয়ে আসা অসম্ভবপর হয়ে ওঠে।

সড়ক দুর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মনোসামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করে অন্যদিকে জাতীয় পর্যায়ে জনমিতির লভ্যংশ সুফল ঘরে তোলা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহ অর্জন, সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রেক্ষিত্ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে উন্নত সনির্ভর রাষ্ট্র বিনির্মানে বাঁধার সৃষ্টি করে।

সড়কে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার সল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নানাবিধ পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতিবছর ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ পাস করা হয়েছে। সড়কে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে উক্ত আইনে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসা দিতে সারা দেশে ২১টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত আহতদের দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে প্রায় সবগুলো ট্রমা সেন্টারই মহাসড়কের পাশে নির্মান করা হয়েছে। প্রতিটি ট্রমা সেন্টারে সাতজন পরামর্শক চিকিৎসক (কনসালট্যান্ট), তিনজন অর্থোপেডিকস সার্জন, দুজন অ্যানেসথেটিস্ট (অবেদনবিদ), দুজন আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪ জন চিকিৎসক, ১০ জন নার্স এবং ফার্মাসিস্ট, রেডিওগ্রাফার, টেকনিশিয়ানসহ ৩৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্তত দুটো টার্গেট সরাসরি সড়ক নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত। এসডিজি টার্গেট ৩.৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এসডিজি টার্গেট ১১.২ অনুসারে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সার্বজনীন টেকসই পরিবহন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি সকলের জন্য সড়ক নিরাপত্তা উন্নত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সড়ক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তার অপরিহার্যতার প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ স্বীকৃতি পেয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয় বরং সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার স্ব স্ব অবস্থান থেকে সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই।

সড়কে লেন মেনে গাড়ী চালানো, সুনির্দিষ্ট গতিবেগ অনুসরণ করা, যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং না করা, রাস্তা পারাপারে আবশ্যিকভাবে জেব্রা ক্রসিং অথবা ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করা, মহাসড়কে অননুমোদিত যানবাহন চলাচল বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগই পারে সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিতের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সড়কে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বর্তমানের সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পুনর্বাসনে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে বর্তমান সরকার একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

#

লেখকঃ সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।

পিআইডি ফিচার